একটি ইসলামী দলের সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের চুক্তি ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের কূটকৌশল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

প্রকাশক
অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল
মে- ২০০৭
বৈশাখ -১৪১৪
রবিউস সানি - ১৪২৮

কম্পোজ
সফটেক কম্পিউটার
বড় মগবাজার, ঢাকা।

মূল্য : নির্ধারিত ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আলেম সমাজের ভূমিকা বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়ে এসেছে। বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে আলেম সমাজের বক্তব্য ও ভূমিকা রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকে। এর মূল কারণ হলো এ দেশের জনগণের অন্তরে ইসলামী আদর্শের প্রতি মহব্বত এবং সেই সূত্রে ওলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।
আসন্ন ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ যে কোনভাবেই হোক ক্ষমতায় যাবার পরিকল্পনা করে। এজন্য তারা নির্বাচনী পরিবেশ তাদের অনুকূলে আনার চেষ্টা চালায়। একদিকে রাজপথে দখলদারিত্ব কায়েম করে পেশীশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে জনগণকে ভোট প্রদানে বাধ্য করার কৌশল অবলম্বন করে, পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী ভূমিকা মুছে ফেলার কৌশল হিসেবে একশ্রেণীর আলেমদেরকে কাছে ভেড়ানোর চেষ্টা করে। নির্বাচনী কৌশল হিসেবে তারা এ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
আওয়ামী লীগ বরাবরই ‘আওয়ামী ওলামা লীগ’ নামে একটি অঙ্গ সংগঠন কায়েম করে রেখেছে। কিন্তু ঐ সকল আলেমের জনগণের মাঝে আলেম হিসেবে কোন ভিত্তি না থাকায় এবং আওয়ামী লীগের বরাবরই ইসলাম বিরোধী ভূমিকার কারণে তারা সুবিধা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা হযরত মাওলানা আজিজুল হকের নেতৃত্বাধীন ইসলামী ঐক্যজোটকে ১৪ দলে ভেড়ানোর পদক্ষেপ হিসেবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আঃ জলিল মাওলানা আজিজুল হকের সাথে একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী কোন আইন পাস করবে না। মাওলানা আজিজুল হকের আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটে যোগদান ও আওয়ামী লীগের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঘটনায় আলেম সমাজ বিস্মিত হন। মাওলানা আজিজুল হকের সাথে চুক্তি করায় বাম বুদ্ধিজীবীরাও আওয়ামী লীগের তীব্র সমালোচনা করে। সমালোচনার মুখে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তাদের আসল উদ্দেশ্যের কথা বলে ফেলেন। তিনি বলেন, “নির্বাচনের কৌশল হিসেবেই আমরা এটা করেছি।”
এই প্রেক্ষাপটে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দেশের শীর্ষ স্থানীয় আলেমদের নিকট আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী ভূমিকা ও ইসলামী জনতাকে ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার কৌশল সম্পর্কে এবং একশ্রেণীর আলেমের মুখোশ উন্মোচন করে বক্তৃতা দেন। তার এ বক্তৃতাটি দেশের আলেম সমাজের নিকট দারুণভাবে সমাদৃত হয়।

তাই সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ এ বক্তৃতাটি দেশের সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম ও সচেতন দেশবাসীর নিকট পৌঁছানের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হলো।
আমরা আশা করি এ পুস্তিকার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে দেশবাসী অবহিত হতে পারবেন। সেই সাথে আওয়ামী লীগের ধর্ম ব্যবসার কৌশলও জানতে পারবেন।
উল্লেখ্য যে, বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে বের হওয়ার আগেই তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিটি বাতিল হয়ে গেছে।

তাসনীম আলম

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একটি ইসলামী দলের সাথে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের চুক্তি ঃ
ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের কূটকৌশল

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আ'লা সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া-আ'লা আলিহী ওয়া-আস্হাবিহী আজমাঈন। ওয়া আ'লাল্লাজিনাত্তাবাউহুম বি-ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন।
আজকের এই ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনের শ্রদ্ধেয় সভাপতি শায়খুল হাদীস মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব (মাদ্দাজিল্লুহুল আলী), অন্যান্য অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত মুয়াজ্জাজ ওলামায়ে কেরাম-
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ্।

২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারী দেশে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই দু'টি মেরুকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এক মেরুতে আছে চারদলীয় জোট, যার প্রধান শরীক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এর সাথে আছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টির দুটি অংশ। এই ধারার রাজনীতির সাথে রয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং ইসলামী মূল্যবোধের একটি সমন্বিত উদ্যোগ। এ ধারার সাথে বাংলাদেশের সর্বস্তরের গণমানুষের মেজরিটি অংশ জড়িত।

-        এটি ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে কেন্দ্রীয় ওলামা মাশায়েখ কমিটি কর্তৃক জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত ওলামা মাশায়েখ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রদত্ত বক্তৃতা।

অপর মের˝তে অবস্থান আওয়ামী লীগের। তাদের সাথে রয়েছে ১৪ দল বা মহাজোট বা মহাজট। এই জোট সম্পর্কে আমি আমাদের চারদল আয়োজিত মহাসমাবেশে বলেছিলাম, ১৪ দল মানে আওয়ামী লীগ আর মহাজোট মানেও আওয়ামী লীগ। আর আওয়ামী লীগ মানে-আওয়ামী লীগ।
আওয়ামী লীগের পরিচয় কী? সেদিন শুধু একটি দিক বলেছিলাম। তারা লাঠিতন্ত্রে আর ফ্যাসিবাদে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। আজকে ওটার সাথে তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যোগ করে কথা বলতে চাই। এই দলের প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। মূলত, মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিলেন। '৫৪ সনের যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে শরীক ছিল এবং ঐ জোটের প্রধান দল ছিল। তার সাথে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক-প্রজা পার্টি (কেএসপি) এবং মরহুম আতাহার আলী সাহেবের নেতৃত্বে যুক্ত হয়েছিল নেজামে ইসলাম পার্টি। তার সাথে আর একটি ইসলামী দল জড়িত ছিল খেলাফতে রব্বানী পার্টি। তাদের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নাম ছিলো তমদ্দুন মজলিস। আর ছাত্র সংগঠনের নাম ছিল ছাত্র শক্তি।
যুক্তফ্রন্ট যখন গঠন হয় তখন ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ছিল না। তখন তাদের নামের সাথে মুসলিম শব্দ যুক্ত ছিল। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ইসলামের পক্ষের শক্তি হিসেবেই ছিলেন। নেজামে ইসলাম তখন পর্যন্ড় এ দেশের ওলামায়ে কেরামের সর্ববৃহৎ সংগঠন ছিল। খেলাফতে রব্বানী পার্টিও তখন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত ইসলামী দল হিসেবে পরিচিত ছিল। মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব বলেছেন, সেই যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর বির˝দ্ধে কোন আইন পাস করা হবে না বলে উলে-খ ছিল। আমি প্রসঙ্গত বলতে চাই 'কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন পাস করব না' এটা কিন্তু ইতিবাচক ইসলামী কথা নয়। এটা একটা নেতিবাচক কথা।
১৯৫৪ সালের পূর্বে আন্দোলনের সময় সরাসরি কুরআনের শাসনের কথাই ছিল। '৫৪-তে এসে হলো কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন করা হবে না। '৭০ সনে নির্বাচনী বক্তৃতায় মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কণ্ঠের ক্যাসেট আপনারা খুঁজে পেলে অথবা পত্র-পত্রিকায় দেখবেন তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করবে না। নির্বাচনকে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না। এই কথাটা তারা অতীতেও অনেকবার বলেছেন। বাস্ড়বে '৭২–'৭৫-এ ক্ষমতায় এসে তারা কী করেছেন? সেটাই হলো তাদের আসল রূপ। '৫০-এর দশকের কথা আমি বলতে চাই না। '৫৬ সালের ইসলামী শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা তারা কোন্ ভাষায় করেছিলেন ঐ কথাও আমি বলতে চাই না। '৫৮-এর পার্লামেন্টে ডেপুটি স্পিকারকে হত্যা করে কি তা˝ব সৃষ্টি করেছিলেন ঐ প্রসঙ্গও আমি এখানে টানতে চাই না। অতীতের অনেক কথা। '৬০-এর দশকের রাজনীতিতে একদিকে ভোটাধিকার, গণতন্ত্র এবং সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেছেন, ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না এ কথাও বলেছেন। কিন্তু বাস্ড়বে '৭২ সালে যে সংবিধান তারা উপহার দিয়েছিলেন সেখানে ছিল সোস্যালিজম এবং সেক্যুলারিজমের কথা।
তাদের শাসনামলে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলামের চিহ্নগুলো মুছে ফেলা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল-াজি খালাক' আয়াতটি মুছে ফেলা হয়েছিল। সলিমুল-াহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি ঠিক সেভাবে

তুলে দেয়া হয়েছিল যেভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই পরিচয়টিকে সামনে রাখতে হবে।

ধর্মভিত্তিক বা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পর '৭৫-এ গিয়ে সকল রাজনৈতিক দল এমনকি আওয়ামী লীগকেও নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশাল গঠন করা হয়েছিল। এটাই তাদের পরিচয়। ১৯৭২-'৭৫-এ তাদের কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হয় আওয়ামী লীগ ইসলামের বিপক্ষের একটি শক্তি, গণতন্ত্রের বিপক্ষের একটি শক্তি।

১৯৭৫-এর পর ২১ বছর তারা ক্ষমতার বাইরে ছিল। আবার '৯৬ তে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেয়েছিল। আমি অনেক অনুষ্ঠানে বলেছি এটা ছিল একটা জাতীয় দুর্ঘটনা। ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের সাথে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের ভুল বুঝাবুঝি এবং তিক্ততার সুযোগে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগ কি করেছে? ইসলামের পক্ষে কোন একটি কাজও তাদের নেই। তারা '৭২–'৭৫-এ যা করেছিলেন তার চেয়েও বেশি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সংসদে তাদের সে পরিমাণ সদস্য ছিল না, যে পরিমাণ সদস্য থাকলে সংবিধান সংশোধন করে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে পারতো এবং ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করতে পারতো। কিন্তু ইসলামী শক্তিগুলোকে নির্মূল করার জন্য তারা যে কৌশল প্রণয়ন করে তা ছিল- "কাউকে মারতে হলে আগে তার একটি বদনাম রটনা কর"।

এ দেশের ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য দেশের ভেতরে বাইরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একটি প্রচারণার আশ্রয় নেয়া হয়। সেই প্রচারণার মূল বক্তব্য ছিল–বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাস করছে, ইসলামের নামে সন্ত্রাস করছে। এর প্রমাণ স্বরূপ তারা দুইটি দলিল পেশ করে। একটি হলো আওয়ামী লীগ শাসনামলে সকল দূতাবাসে ইংরেজি এবং আরবী ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছে। আরবি ভাষায় পুস্তিকার নাম ছিল "আল এরহাব বি-ইসমিল ইসলাম", ইংরেজি পুস্তিকার নাম ছিল "টেররিজম ইন দ্যা নেইম অব ইসলাম"। সারা দুনিয়ায় এই দুইটি পুস্তিকার মাধ্যমে বাংলাদেশের আলেম-ওলামা, সকল ইসলামী শক্তিকে তারা সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে। বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মনে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির ব্যাপারে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে তাদের আশীর্বাদ নিয়ে তারা চিরদিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিল। আর তাদের রাজনৈতিক প্রতিযোগী, প্রতিপক্ষ বিএনপি যাতে ইসলামী দলগুলোর সাথে ঐক্য গড়তে না পারে, ঐক্য গড়লে পশ্চিমা বিশ্বের বিরাগভাজন হয়, পশ্চিমা বিশ্বের আশীর্বাদ নিতে সক্ষম না হয়, সে জন্যই এই প্রচারণা চালানো হয়।

শুধু প্রচারণার মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা নিজেরা কিছু জঙ্গি সংগঠনের জন্ম দেয়। হারকাতুল জিহাদের নাম কখনও শুনিনি। কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে কে বা কারা তার উপর চড়াও হয়। তাদেরকে গ্রেফতার করা হলো। প্রাথমিকভাবে তাদের পরিচয় পাওয়া গেল–তারা সবাই ছাত্রলীগ করত। তাদের কাছ থেকে জবানবন্দী নিয়ে পাওয়া গেল তারা আসল দোষী নয়। তাদেরকে এই কাজ করতে কিছু সংখ্যক হুজুর উদ্বুদ্ধ করেছে। একটা গুজব রটানো হলো। ঐ গুজবটা কী? একটা ইসলামী সংগঠন যার নাম হারকাতুল জিহাদ। অন্তত আমি মতিউর রহমান নিজামী এ ঘটনার পর প্রথম এই নামটির সাথে পরিচিত হয়েছি। এর আগে এই নামের সাথে আমার পরিচয় ছিল না। আপনাদের কারও পরিচয় ছিল কিনা আমি জানি না।

এর পর আস্তে আস্তে আরও কিছু উগ্রপন্থী তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের নাম আসতে থাকে। এর মধ্যে যশোরের উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের মর্মান্তিক ঘটনায় অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তখন আমি দেশের বাইরে আরব আমিরাত সফরে ছিলাম। পত্রিকায় দেখেছি অনুষ্ঠানে হাসান ইমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তার কোন এক ছাত্র তাকে একটি চিরকুট পাঠায়"স্যার, আপনি মঞ্চ থেকে

তাড়াতাড়ি সরে যান”। হাসান ইমাম মঞ্চ ত্যাগের অল্প পরেই সেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়। যদি সেদিন হাসান ইমামকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো তাহলে উদীচীর ঘটনা কারা ঘটিয়েছিল তা বেরিয়ে আসতো। এই সত্য আবিষ্কারের জন্য “মদিনা হুজুর” নামে একজন নিরীহ মানুষের কাপড়ের দোকানে অস্ত্র ঢুকিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইসলামী ছাত্র শিবিরেরও কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। তরিকুল ইসলাম সাহেবকে এই মামলার আসামী করে তাকেও হয়রানির শিকার বানানো হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ শাসনামলের ঐ ঘটনার তদন্ত করে আসল দোষী কারা তা প্রকাশ করা হয়নি। কারণ ঘটনা ঘটানো হয়েছে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে- ইসলামী শক্তিগুলোকে টেররিস্ট প্রমাণ করার জন্য।

এর পরে রমনা বটমূলে যে ঘটনা ঘটল সেখানেও ছিলেন হাসান ইমাম। দুষ্ট ছেলেরা ঠাট্টা করে বলতো- যেখানে হাসান ইমাম, সেখানেই বোমা। বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের সাথে সাথেই বিটিভির মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে হাসান ইমাম ধারাভাষ্য দেয়া শুরু করে। এটা কারা ঘটিয়েছে এবং দশ মিনিটের মধ্যে কালো কাপড়ে সাদা অক্ষরে লেখা ব্যানার নিয়ে মিছিল শুরু হয়েছিল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতে রাখার ঘটনা ঘটলো। সেই মুফতি হান্নানের পারিবারিক পরিচয় সেই সময়ের পত্র-পত্রিকায় এসেছে- তার চাচা কি করে, তার ভাই কি করে। দেখা গেছে সে আওয়ামী ঘরানার লোক।

আওয়ামী লীগ আমলে মুফতি হান্নানকে গ্রেফতার করা হয়নি, জোট সরকার গ্রেফতার করেছে। অন্তত এই একটা ব্যাপারে জোট সরকারের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল। শেখ হাসিনার প্রাণনাশের জন্য যে ব্যক্তিটি ৭৬ কেজি ওজনের বোমা পুঁতেছিল সে শেখ হাসিনার শাসনামলে ধরা পড়েনি। কিন্তু জোট সরকারের আমলে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিচার হবে, বিচার প্রক্রিয়া চলছে।

আওয়ামী আমলে কমিউনিস্ট পার্টির মহাসমাবেশেও বোমা বিস্ফোরণ হলো। তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বললেন, ঐ মৌলবাদীরা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, না আমরা তার এই কথার সাথে একমত নই। নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের নিজেদের অফিসে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেই ঘটনারও কোন তদন্ত করা হয়নি।

এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের অভ্যুত্থান ঘটছে দেশে-দেশের বাইরে এটা প্রমাণ করে ইসলামী শক্তি নির্মূল করার একটি পটভূমি, একটি প্রেক্ষাপট তৈরি করার জন্য আওয়ামী লীগ ৫ বছরব্যাপী এসব কাজ করেছে। তাদের আমলে তারা শায়খুল হাদীস সাহেবকেও পুলিশ হত্যার মামলায় জড়িয়ে ঐ উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করে।

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেলকে গ্রেফতার করার পর ঢাকার অলিতে গলিতে ডিবি পুলিশ পাহারা বসিয়েছিল যাতে কোন প্রতিবাদ মিছিল না হতে পারে। অথচ তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন। বায়তুল মোকাররম মসজিদ থেকে জুমার নামাজ শেষে মিছিল বের হতে পারে এটা অনুমান করে তারা মসজিদের মধ্যে টিয়ার গ্যাস মেরেছে, গুলি ছুঁড়েছে। জুতা পায়ে মসজিদের মধ্যে ঢুকে কিভাবে মুসল্লীদের লাঠি পেটা করেছে, জুতা পেটা করেছে, লাথি মেরেছে এই দৃশ্য সম্ভবত ইহুদী-খ্রিস্টান দেশেও পাওয়া কঠিন। এটা হলো আওয়ামী লীগের পরিচয়।

কওমী মাদরাসা ধ্বংস করার জন্য সেখানে লাদেন বাহিনী, আল-কায়েদা বাহিনী আবিষ্কার করা হয়েছে। কওমী মাদরাসার বিরুদ্ধে এবং গোটা মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে দুনিয়াব্যাপী প্রচারণা শুরু করা হয়েছিল। এগুলো নাকি জঙ্গি তৈরির আস্তানা। আমি আমার দুইটি পুস্তিকায় প্রমাণ করেছি দুনিয়ার পরিচিত প্রতিষ্ঠিত কোন ইসলামী দলের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। ওলামায়ে কেরাম জঙ্গিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ ইসলাম তথাকথিত জঙ্গিবাদ অনুমোদন করে না।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। বৃটিশদের উপমহাদেশ ত্যাগ করা পর্যন্ড় ওলামায়ে কেরামের ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু ওলামায়ে কেরাম সন্ত্রাসের পথে আন্দোলন করেননি। তারা নিয়মতান্ত্রিক শান্ড়িপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদের স্বাক্ষর রেখেছেন। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের সাধনা ছিল দেশের আলেম ওলামা এবং ইসলামী দলকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করে বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আর সেই সাথে ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গি তৈরির আখড়া হিসেবে চিহ্নিত করে এগুলোকে কিভাবে কোণঠাসা করা যায় সে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
এই হলো ১৪ দল ও মহাজোটের প্রধান শরীক দল আওয়ামী লীগের কিঞ্চিত পরিচিতি। এর সাথে বাকী ১৩ দলের যারা আছেন তাদের লোকজন থাক আর না থাক তাদের কণ্ঠ আরও বেশি জোরেশোরে বেজে উঠে। তারা কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কেউ অতি বিপ-বী এবং ধর্মকে আফিম মনে করার মত লোকও সেখানে আছে। নাস্ড়িক্যবাদে বিশ্বাসী লোকেরা সেখানে আছে।
মরহুম শেখ মুজিবকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি যা চেয়েছিলেন তাকে কিছু লোক তার বিপরীতে নিয়ে গেছে। অনেক ঘটনাই এর সাক্ষী। তাকে দিয়ে একদলীয় বাকশাল গঠন করা হলো। সেই অশুভ শক্তি এখন আওয়ামী লীগের পেছনে। ১৪ দলের ১৩ দল আওয়ামী লীগের জন্য আন-লাকি থার্টিন হিসেবে প্রমাণিত হবে, হবেই ইনশাআল-াহ। তাদের কারও সিট (সংসদে আসন) নেই। নির্বাচনেও ভবিষ্যত নেই। তারা শেখ হাসিনাকে পয়েন্ট অব নো রিটার্নে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। এরা সবাই উগ্র ধর্মবিরোধী, ইসলাম বিরোধী, ইসলাম বিদ্বেষী। কাজেই আওয়ামী লীগ নিজে ইসলামের বিপক্ষে ভূমিকা রাখছে, তার সাথে এরা যোগ হয়ে আওয়ামী লীগের ইসলাম বিরোধী ভূমিকাকে আরও জোরদার করছে। তার সাথে যোগ হয়েছে এলডিপি এবং জাতীয় পার্টি। এখন এদের কারণে মহাজোট হলো না মহাজট হলো এটাও ভবিষ্যতের রাজনীতির ইতিহাস বলে দিবে।
এই মহাজোটের বা মহাজটের মূল শক্তি আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের এই চিত্রটাকে আমরা সামনে রাখতে চাই। গতকাল (২৯ ডিসেম্বর-২০০৬) শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবের একটি বক্তব্য আমি কোন এক পত্রিকায় দেখলাম 'শত্র"রা এবং বিভিন্ন মহল আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিপক্ষের শক্তি হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।' এটা প্রমাণ করার কি দরকার আছে? আওয়ামী লীগ নামে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ড় আওয়ামী লীগের অবস্থান ইসলামের বিপক্ষে, বিপক্ষে এবং বিপক্ষে। জ্ঞানপাপী এবং বিবেকবর্জিত ব্যক্তি না হলে আর কেউ বলতে পারে না যে, আওয়ামী লীগকে ইসলামের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কোন জুড়ি নেই। ইসলামের বিপক্ষেই তাদের অবস্থান। সেক্যুলারিজমের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তারা ধর্মহীনতার স্বার্থই দেখেছে বারবার।
বাংলাদেশে ইসলাম একটি ফ্যাক্টর। নির্বাচনের আগে তারা নিজেদের বেশ-ভূষায় কিছু পরিবর্তন এনে, কিছু শে-াগানে পরিবর্তন এনে, কোন কোন সময় কিছু কিছু ইসলামের নাম ব্যবহারকারীদের আশীর্বাদ নিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করে থাকে।
আমি পরিষ্কার বলতে চাই, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আর ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা এক জিনিস নয়। এ দেশের ছোট বড় যত ইসলামী দল আছে তারা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ কাঠামোকে গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসন ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য আছে, অর্থনীতি কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে তাদের বক্তব্য আছে, শিক্ষা-সংস্কৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাদের বক্তব্য আছে।
পক্ষান্ড়রে আওয়ামী লীগ তাদের দর্শন হিসেবে লিখিত দিয়েছে তারা সেক্যুলার-ধর্মনিরপেক্ষ। আর বাস্ড়বে তারা প্রমাণ করেছে আওয়ামী লীগ যে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তার আসল পরিচয় ধর্মহীনতা। এরপর তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে শে-াগান দেয় "লা-ইলাহা ইল-াল-াহ, নৌকার মালিক তুই

আল্লাহ।" এটা ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার একটি নিকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি ইসলামী লেবাসধারী দুই-চারজনকে স্টেজে বসিয়ে আশীর্বাদ নেয়া ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার আরেকটি কৌশল। তাদের সর্বশেষ কৌশল হলো শায়খুল হাদীস আজিজুল হক সাহেবকে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করাতে সফল হওয়া। ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করা ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। যিনি তাদের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, তিনিই পরবর্তীতে বলেছেন, এটা রাজনৈতিক কৌশল। আর কিছু বলার দরকার আছে কি? নির্বাচনী কৌশল! তার মানে নির্বাচনে সুবিধা আদায়ের জন্যে হুজুরদেরকে ব্যবহার করার একটি উদ্যোগ। আমি ঐ চুক্তির ব্যাপারে পরে আসছি।

বলছিলাম দুইটি পক্ষ। এক পক্ষে আছে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টি। এই পক্ষের প্রধান শরীক দল বিএনপি। আমরা যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই এভাবে বিএনপি বলে না। কিন্তু ইসলামের ভিত্তিতে যারা রাজনীতি করতে চায় তাদেরকে নিষিদ্ধ করতে হবে এই কথাও তারা বলে না। বরং আওয়ামী লীগ ইসলামের ভিত্তিতে রাজনীতি করা নিষিদ্ধ করেছিল। তারা ইসলামী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করেছিল, আর শহীদ প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনী এনে বিসমিল্লাহ যোগ করেছিলেন। সেক্যুলারিজমের জায়গায় "আল্লাহর প্রতি ঈমান হবে সকল কর্মকাণ্ডের উৎস" এই কথা সংযোজন করেছিলেন। সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ন্যায় বিচারে রূপান্তরিত করেছিলেন।

খতীবে আযম মাওলানা সিদ্দীক আহমদ মরহুমসহ এ দেশের ওলামায়ে কেরাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দিয়েছিলেন। এই একটি ভাল কাজের জন্যে এবং এই কাজটি করে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু বাংলাদেশের ভেতরে নয়, বাংলাদেশের বাইরেও মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের প্রতিও সহানুভূতি টানতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। অতএব, বিএনপি যত দিন বিসমিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানের এই দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে- এ দেশের আলেম ওলামা, ইসলামী দলের সহানুভূতি এবং সমর্থনও ততোদিন তাদের প্রতি থাকবে। কোন দিন যদি তারা এই দর্শন ত্যাগ করে, তাহলে তখন তাদের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিই থাকবে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিসমিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণার উপরে তারা আছে বলে আমরা মনে করছি।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই উদ্যোগের কারণে আজকে খেলাফত আন্দোলন বলেন, খেলাফত মজলিস বলেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বলেন আর ইসলামী ঐক্যজোট বলেন, জামায়াতে ইসলামী বলেন, এই সব ইসলামী দল গণমানুষের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। বিএনপি আমাদের মত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, শাসন ব্যবস্থা না চাইলেও ইসলামী রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা যারা কায়েম করতে চায় তাদেরকে তারা সম্মান করে। তারা তাদের কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করার পক্ষপাতি নয়। এখনও পর্যন্ত নয়। ভবিষ্যতের কথা আল্লাহ ভাল জানেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের উদ্যোগেই মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিমের সার্টিফিকেট মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এর সমমান পায়। '৯১-এর পরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সার্থক উত্তরসূরী বেগম খালেদা জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের উপরে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেন।

আর এবার ক্ষমতায় এসে জোট সরকারের যাত্রা শুরুর সাথে সাথে মাদরাসা শিক্ষার উন্নতি ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিটি করা হয়েছিল। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রস্তাবকে সামনে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফাযিল এবং কামিলকে যথাক্রমে স্নাতক ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান প্রদানের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে এবং পার্লামেন্টে এ ব্যাপারে আইনও পাস হয়েছে। একই সাথে কওমী মাদরাসার

সনদেরও স্বীকৃতির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। ইসলামের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এটা জোট সরকারের একটা বড় প্রয়াস ছিল।

জোট সরকার কর্তৃক সরকার গঠনের পরপরই দেশের ভেতরে-বাইরে আওয়ামী বলয় প্রপাগান্ডা জোরদার করে যে, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান হয়েছে, ইসলামী জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। এই প্রচারণার মাধ্যমে আমাদের প্রধান শরীক দলের উপরে তারা স্নায়ুচাপ সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালিয়ে মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়, যাতে করে ইসলামী দলগুলোকে তারা বোঝা ভাবতে বাধ্য হয়।

এভাবে ইসলামের নামে জঙ্গি তৎপরতা মূলত ইসলামী আন্দোলনকে খতম করার এবং জোট সরকারকে বেকায়দায় ফেলারই একটা নীল নক্শার অংশ ছিল। এটা আরও জোরদার করার জন্য তারা উৎসাহবোধ করে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে বিমান হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পর। এটার জন্য আসল দায়ী কারা? এর রহস্য উদঘাটন না করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য তদন্ত ছাড়াই মুসলমানদের উপর এর দায়-দায়িত্ব চাপানো হলো। এই অজুহাতে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হলো। আফগানিস্তানে তালেবানদের শাসন চলছিল। তালেবানদের প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের সাংঘাতিক এলার্জি। অতএব, আফগানিস্তানে এই ঘটনা ঘটার পর আমাদের বন্ধুরা উৎসাহিত হলো। যদি এটা প্রচার করে পশ্চিমা বিশ্বকে বিশ্বাস করানো যায় যে, বেগম খালেদা জিয়ার সরকারে তালেবান আছে, পার্লামেন্টে তালেবান আছে, তাহলে বোধ হয় আফগানিস্তানে যেভাবে যুদ্ধ করে তালেবান সরকারের পতন ঘটিয়ে তাদের পছন্দের সরকার গঠন করেছিল, একটা

হস্তক্ষেপ হয়েছিল, যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল বাংলাদেশেও তাই করা হবে। কিন্তু সে রকম কিছু না ঘটায় হতাশ হয়ে তারপর তারা পার্লামেন্টে আসে।

এভাবে এই প্রচারণার একটা পর্যায়ে বাংলাদেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা হলো। হামলাকারীরা বোমার সাথে লিফলেট দিয়ে আল-াহর আইনের কথা বলল। আর আল-াহর আইন জামায়াতে ইসলামী চায়। আর যেহেতু ঐ ইসলামী দলগুলোও এটা চায় অতএব জামায়াত এটা করেছে- উঠেপড়ে লাগলো এই প্রচারণায়। এই প্রচারণার সময় যখন জোট সরকার জঙ্গীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিল, এই প্রচারণা পন্ড করলো, এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল, তখন যে ব্যক্তিটির দিকে শেখ হাসিনা অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন সে ব্যক্তিকে এখন নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে হচ্ছে এবং যে প্রতিষ্ঠানটির নাম নিয়েছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রধানকে এখন নৌকা মার্কায় নির্বাচন করতে হচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তির কারণে শায়খুল হাদীস আল-ামা আজিজুল হক সাহেব তাদের সাথে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছেন অথবা করতে গিয়ে একটা পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। আমি কথা বেশি বাড়াতে চাই না। কথায় কথা আসে। আমি বলতে চেয়েছিলাম একটা ঐ পক্ষ আর তাদের চরিত্র এই।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বলা হয় জামায়াতে ইসলামী এই পাঁচ বছরে কি করেছে ইসলামের পক্ষে? আমি বেশি কথা বলতে চাই না। বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক চক্র এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়াসমূহ পরবর্তী আফগানিস্তানে পরিণত করার ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত করেছিল। সংসদের ভেতরে-বাইরে তাদের এ চক্রান্ত নস্যাৎ করার জন্য জামায়াতে ইসলামী এ দেশের আলেম ওলামাদেরকে সাথে নিয়ে এককভাবে ভূমিকা পালন করেছে। পার্লামেন্টে আফগান ও ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে কে কথা বলেছিল? দেশের পত্র-পত্রিকার পাতা খুলে দেখেন আফগানিস্তানে যুদ্ধ যখন চলে তখন জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে আমি যে কথা বলেছি তার ধারে কাছেও আর কেউ কথা বলেছে কিনা? ইরাক যুদ্ধের আগেও বলেছিলাম সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে ইরাকের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ আরও সম্প্রসারিত হবে। যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরও আমি সংসদে একই বক্তব্য রেখেছি।

সংসদে খতমে নবুয়্যত প্রসঙ্গে কেবল আমিই কথা বলেছি। ইসলামী ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে তিনজন মুফতি পার্লামেন্টে ছিলেন। পার্লামেন্টের নথিপত্র খুঁজে দেখেন কেউ এ ব্যাপারে একটি কথাও বলেছেন কিনা? আমি এ ব্যাপারে কথা বলেছি এবং আমি কথা বলতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছি। আমি প্রমাণ দিয়ে বলেছি রাসূল (সাঃ) কে যারা শেষ নবী মানেন না তারা মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। ওলামায়ে কেরামের এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ওআইসির ফিকাহ একাডেমীর রেজুলেশন পড়ে শুনিয়ে এটা প্রতিষ্ঠিত করেছি।
ইসলামের ভিত্তিতে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে জামায়াতে ইসলামী ভূমিকা রেখে আসছে। এ জন্য আমরা মনে করি আমাদের সাংগঠনিক দিকটি সম্প্রসারিত করতে হবে, মজবুত করতে হবে। ইসলামী দল একক শক্তিতে অথবা সবগুলো ইসলামী শক্তি সম্মিলিত শক্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে আসার আগে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও চালু করা যায় কিনা এর ইতিহাস তো গোটা পঞ্চাশের দশকে আছে। একটু আগেও বলেছি ৫৪-তে যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্টের শরীক দল আওয়ামী লীগেরও নামের সাথে মুসলিম ছিল, আর বাকি তিনটির দুইটা ডাইরেক্ট ইসলামী দল ছিল। শেরে বাংলা ফজলুল হক সাহেবও ইসলামের পক্ষের শক্তি ছিলেন। কিন্তু সরকার গঠন করার পরও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি। কাজেই জামায়াতে ইসলামী বাস্তববাদী। জামায়াত জনগণকে সাথে নিয়ে, জনগণকে তৈরী করে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নিয়ে ইসলামের পক্ষে অর্থবহ পরিবর্তন আনতে চায়। এ কথা আমরা সংসদের ভেতরেও বলেছি, বাইরেও বলেছি এবং সর্বক্ষণ আমরা এ কাজে আছি। এ কাজের বিপক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে যেসব চক্রান্ত হচ্ছে আমরা সেগুলোর মোকাবিলা করছি এবং এগুলোর মোকাবিলা করতে গিয়ে আমরা শুধু জামায়াতের পক্ষে কথা বলিনি, এ দেশের সকল ওলামায়ে কেরাম এবং সকল ইসলামী দলের পক্ষে পার্লামেন্টের ভেতরে-বাইরে কথা বলেছি। অতএব, জামায়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা অবান্তর।

আমি এখন আসতে চাই, চুক্তি প্রসঙ্গে। আসলে এ চুক্তিটা আহামরি এমন কিছু বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এতে কোন পক্ষের খুশি হওয়ার, পুলকিত হওয়ার কিছু নেই। আবার কোন পক্ষের রুষ্ট হওয়ারও তেমন কিছু নেই। আমি লক্ষ্য করছি- ওলামায়ে কেরাম এতে গর্বিত হননি, শংকিত হয়েছেন- হায়! হায়! কি সর্বনাশ হয়ে গেল!

আওয়ামী লীগের অবস্থান এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বেরও পক্ষে নয়, ইসলামী মূল্যবোধেরও পক্ষে নয়। আজিজুল হক সাহেবের সাথে একটি চুক্তিতে সাময়িক কিছু বিভ্রান্তি হতে পারে এবং এটা আওয়ামী লীগের ধর্মকে রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার একটি কূটচাল ছাড়া আর কিছু নয়। ঘটনাক্রমে তিনি কূটচালের শিকার হয়েছেন।

এতে এক নাম্বারে বলা হয়েছে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন তারা করবে না। এটা কি নতুন কথা? এটা তো আওয়ামী লীগ '৫৪-তেও বলেছে, '৭০-এও বলেছে। কিন্তু দুই দুইবার ক্ষমতায় গিয়ে তারা কি করেছে সেটা সবার জানা আছে।
তারা চুক্তি করেছে- কওমী মাদরাসার সনদের সরকারী স্বীকৃতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। আচ্ছা এই কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দিল কে? এটা দিয়েছে জোট সরকার। জোট সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে আর আওয়ামী লীগ ও তাদের দোসররা এর বিরোধিতা করেছে। কওমী সনদের স্বীকৃতিকে নিয়ে আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা ব্যঙ্গ করে লেখালেখি করেছে। আওয়ামী লীগ নিজেও এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ

করেছে। তারাই নাকি এটা বাস্তবায়ন করবে। এটার বাস্তবায়ন যদি ওলামায়ে কেরাম, আসাতেজায়ে কেরাম এবং ছাত্ররা চান তাহলে জোট সরকারকে ক্ষমতায় আনার কোন বিকল্প নেই।

তারা চুক্তি করেছে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে। বলুন তো এটা কি চুক্তি করে বলার জিনিস? উনারা কি চেয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। তারা চেয়েছেন, যারা আল্লাহর রাসূলকে (সাঃ) সর্বশেষ নবী মানে না তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু জলিল সাহেব স্পষ্ট বলেছেন, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার নেই। তাহলে এখানে ধোঁকা খেয়েছেন। মোমেনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ধোঁকা দেয় না, ধোঁকায় পড়েও না। এখানে রীতিমত ধোঁকা খাওয়া হয়েছে। ইতিহাস এটা প্রমাণ করবে।

তারা আরো চুক্তি করেছেন, সনদ প্রাপ্ত আলেমরা ফতোয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবেন। সনদবিহীন কোন ব্যক্তি ফতোয়া দিতে পারবেন না। ফারায়েজের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কাছে আসা কি বন্ধ হয়েছে? বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে আসা কি বন্ধ হয়েছে? আওয়ামী লীগ শাসনামলে ফতোয়া দানকে নিষিদ্ধ করে হাইকোর্টে রায় প্রদান করা হয়। যে জাস্টিস সাহেব এই রায় দিয়েছিলেন তিনি এখন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী। আওয়ামী রাজনীতির ধারক-বাহক হিসেবে তিনি কলাম লেখেন, নিবন্ধ লেখেন। এর পরে এটা কোর্টের ব্যাপার। কোর্টে এর বিরুদ্ধে আপিল করার পর এই রায় স্থগিত আছে। এই রায় স্থগিত থাকার কারণে ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া দেয়ার অধিকার সংরক্ষিত আছে এবং ভাল করে এই কেসটা ডিল করলে ঐ রায় বাতিলের সুযোগ আছে। কাজেই এখানে তারা নতুন কিছু অর্জন করেছেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

চুক্তির শেষ পয়েন্টটা হলো, নবী-রাসূল ও সাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে সমালোচনা ও কুৎসা রটনা দণ্ডনীয় অপরাধ। আওয়ামী লীগের আমলে দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে কি আওয়ামী লীগ কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল? দাউদ হায়দারকে তারা নিরাপদে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে কোন্ আইনের আওতায়?। তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন হয়েছিল এ দেশে কুরআনের বিরুদ্ধে, রাসূলের বিরুদ্ধে বলার কারণে, তখন আওয়ামী লীগের ভূমিকা কি ছিল? তসলিমা নাসরিনের ইসলাম অবমাননা, কুরআন অবমাননা, আল্লাহর রাসূলের অবমাননার ব্যাপারে তারা কি তসলিমা নাসরিনের বিপক্ষে না পক্ষে ছিল?

এ চুক্তিটা আওয়ামী লীগের জন্য একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে এবং হুজুরদের জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগের সমস্যা- তাদের প্রগতিশীল বন্ধুরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছেন। গাফ্ফার চৌধুরীর লেখা যদি পড়তেন, বদরুদ্দিন ওমরের লেখা যদি পড়তেন; আরও অনেকেই লিখছে কত বলবো? এর ফলে আওয়ামী লীগ তাদের ঘরের মধ্যে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তারা যে সমস্ত সমঝোতা করেছে বুঝে শুনেই করেছে। চুক্তি বলেই কি মানতে হবে? আবদুল জলিল সাহেব বলছেন এটা একটা কৌশল। পরের দিনই শেখ হাসিনা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সদস্যদের প্রতিনিধিদেরকে বলেছেন, বাংলাদেশ একটি সেক্যুলার দেশ, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এই চুক্তি যদি আন্তরিকতার সাথে স্বাক্ষর করে থাকেন তাহলে তাদের বলতে হবে যে, আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা আজ থেকে বর্জন করছি। তারা এটা বলেননি। বরং হুজুরদের দিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হুজুরদের দিয়ে ব্যাখ্যা দেয়া হয় আওয়ামী লীগের অবস্থান ইসলামের বিপক্ষে নয়, কিন্তু কিছু লোক শত্রুতা করে তাদের অবস্থান ইসলামের বিপক্ষে প্রমাণের চেষ্টা করছে।

আমরা এ ধরনের কথা বলি না। আমি বলছিলাম এ চুক্তি আওয়ামী লীগের জন্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগকে এ সমস্যা উতরাতে হবে। একথা তারা বললেই হয়, 'এ রকম চুক্তি অতীতে আমরা কত করেছি। চুক্তি করলেই মানতে হবে কেন'? আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন করেছে,

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে, সেই আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়্যত আন্দোলনের মহাসচিব তিনিও কিন্তু ১৪ দলের কাছে গিয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করেছেন। তাহলে জোট সরকারের আমলে কাদিয়ানী স্থাপনা দখল করার জন্যে যারা উগ্র কর্মসূচি দিয়েছিলেন তারা আসলে ওদেরই লোক। সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য- বাংলাদেশে উগ্রবাদীরা আছে, ধর্মান্ধতা আছে, সংখ্যালঘুরা নিরাপদ নয়, এই সব কথার প্রমাণ পশ্চিমা জগতের কাছে সরবরাহ করার জন্য তারা ভাড়ায় খেটে এ কাজগুলো করেছেন। এদের ব্যাপারে আমাদেরকে সজাগ এবং সোচ্চার থাকতে হবে।

জোট সরকারের ইসলামের পক্ষের আরেকটি অবদানের কথা বলছি। আওয়ামী লীগ কওমী মাদরাসা ধ্বংস করার জন্য কওমী মাদ্রাসায় লাদেন বাহিনী, আল-কায়েদা বাহিনী আবিষ্কার করে তাদের উপর আঘাত করেছে। আর আলীয়া নেসাবের মাদরাসা বন্ধ করার জন্য এমপিও বাতিল করার সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করছিল। ৩০০ মাদরাসার এমপিও তারা বাতিল করেছিল। জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই ঐ সব মাদরাসার এমপিও চালু করেছে। এর পরে আরও শত শত নতুন মাদরাসা এমপিওভুক্ত হয়েছে। জঙ্গিবাদের মোকাবেলায় জোট সরকার সন্তোষজনক ভূমিকা রেখেছে।

জঙ্গিবাদকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের পক্ষের মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবীরা একযোগে বাংলাদেশের বিপক্ষে পশ্চিমা বিশ্বকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য সাধনা করেছেন, প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন।

আমাদের প্রতিবেশী দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু মিডিয়ার সাথেও তাদের চুক্তি হয়েছে। আমি এই কিছুদিন আগে একটি বই দেখেছিলাম "ইধহমষধফবংয ঃযব হবীঃ অভমযধহরংঃধহচ। এ বই আমাদের প্রতিবেশী দেশের একজন বুদ্ধিজীবী লিখেছেন। প্রকাশনা উৎসব হয়েছে সেদিন, যেদিন গাজীপুরে ঐ জেএমবির লোকেরা আত্মঘাতি বোমা হামলায় কয়েকজন এ্যাডভোকেটকে হত্যা করেছে। এ বই যারা লিখেছেন তাদেরকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করেছেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা। যাদের নাম ওখানে আছে তারা আওয়ামী সমর্থক।

এর মোকাবেলায় জোট সরকার আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। এ দেশের মানুষ যাদের কাছ থেকে, যাদের মুখ থেকে ইসলামের কথা শুনে আসছে তারা জঙ্গি নয়।

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করা যে অল্প দিনে সম্ভব হয়েছে তার প্রধান কারণ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের সম্পর্ক নেই। আর দ্বিতীয় কারণ এ দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী দলগুলো জঙ্গিবাদকে অনুমোদন করে না।

তারা সমস্বরে ঐক্যবদ্ধভাবে ঘোষণা করেছেন, যারা ইসলামের নাম নিয়ে জঙ্গি তৎপরতা চালাচ্ছে তারা বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট এবং বিপথগামী। তারা ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল, হাতের খেলনা। এ কারণেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যেমন সফল হয়েছে, তেমনি জঙ্গিবাদের অপবাদ থেকে বাংলাদেশকে আল্লাহ তায়ালা হেফাযত করেছেন। এ দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামী দল-সংগঠন যে এ অপবাদ থেকে মুক্ত এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জোট সরকার এবং জোট সরকারের শরীক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত জোরালো ভূমিকা রেখেছে।

আমি এ কয়টি কথা বলে আপনাদের কাছে উল্লেখিত চুক্তি সম্পর্কে একটা চুটকি বলে আমার কথা শেষ করতে চাই। যদিও আমি চুটকি বলতে অভ্যস্ত নই। উর্দূ ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যার অর্থ 'হাতি দেখায় বাহিরের দুই দাঁত, কিন্তু খেতে ব্যবহার করে ভিতরের দাঁত'। এ চুক্তি হাতির বাইরের দাঁত। ওলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে। কিন্তু পর্দার আড়ালে কি হয়েছে ওলামায়ে কেরামকে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়ে এ বিভ্রান্তি যাতে এ দেশের ইসলামী আন্দোলনকে স্পর্শ করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

অতীতের ন্যায় চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় এনে আওয়ামী লীগের ইসলামের প্রতি বৈরী মনোভাবের মোকাবিলা করে এ দেশের দ্বীনি প্রতিষ্ঠানকে সংহত করতে হবে। আগামী নির্বাচনে চারদলীয় জোটকে বিজয়ী করে আওয়ামী অপরাজনীতিকে, তাদের গণতন্ত্রের উপরে লাঠিতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার এ অশুভ চক্রান্ড়কে আবার পরাজিত করতে হবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে দেশের সকল ওলামায়ে কেরাম এবং দেশের সর্বস্ড়রের মানুষের কাছে এ আহ্বান এ আবেদন জানিয়ে আপনাদের সবাইকে আন্ড়রিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল-াহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।